৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUN 29 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

পাঁচ জেলা নিরক্ষরতামুক্ত

শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির সংবাদ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নগামী দেশের জন্য নিঃসন্দেহে সবচাইতে বড় একটি সুসংবাদ। পত্রিকান্তরে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে বাসস'র একটি খবরে গত শনিবার বলা হয়েছে, সরকারের নিরন্তর প্রয়াসের দরুন অর্জিত প্রধান সাফল্যগুলোর মধ্যে আছে দেশের ৫টি জেলাকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা। জেলাগুলো হলো, চুয়াডাঙ্গা, লালমনিরহাট, মাগুরা, রাজশাহী এবং গাইবান্ধা। খবর নিশ্চয়ই দেশবাসীকে নতুন আশায় উজ্জীবিত করবে। এ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন, ২০০৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হবে। এসব ঘোষণা নিছক কাগুজে ঘোষণা না হলে ২০০৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সরকারী লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল অবশ্য বলে, সরকারী ও বেসরকারী খাতের সমন্বিত উদ্যোগ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ– এই ক'টি বিষয় নিশ্চিত করার ওপরেই ঐ লক্ষ্য অর্জন নির্ভর করছে। আমরা কি এসব বিষয় নিশ্চিত করতে পেরেছি? প্রসঙ্গত আমরা নোবেল বিজয়ী বাঙালী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কিছু কথা তুলে ধরতে পারি। প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে জনসাধারণকে অধিক সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ নেই বলে যাঁরা প্রচার করে বেড়ান, তাঁদের সঙ্গে তিনি একমত নন বলে জানান। ভারতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তি পেরিয়ে যাওয়ার পরও সেখানে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নিরক্ষতার আঁধারে নিমজ্জিত। ভারতের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে অমর্ত্য সেন প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা ও এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের যে-তাগিদ দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এখানে বাজেটে প্রতিবছর শিক্ষাখাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ দেখানো হচ্ছে। কিন্তু একদিকে তা যেমন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, অন্যদিকে বরাদ্দকৃত অর্থ ঠিকভাবে কাজে লাগান হচ্ছে কিনা সে প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে। অন্য অনেক খাতের মতোই চুরি-দুর্নীতি-অপচয়ের রাহুগ্রাসে চলে যাওয়ার দরুন সে-বরাদ্দবৃদ্ধি বা সর্বাধিক বরাদ্দের প্রকৃত সুফল ভোগ করছে অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরাই।

বোধ করি সেজন্যই সরকারীভাবে যখন দাবি করা হচ্ছে, বিগত তিন বছরে গৃহীত বিভিন্ন সরকারী পদক্ষেপের দরুন শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সাক্ষরতার হার ৫৬ শতাংশে পৌঁছেছে, তখন পত্রিপত্রিকায় খবর বেরোচ্ছে, উত্তরাঞ্চলে প্রায় পাঁচ লাখ শিশু স্কুলেই যায়না। পত্রিকান্তরে এই মাত্র গত মার্চ মাসে প্রকাশিত এক খবরে আছে ঃ উত্তরাঞ্চলের অভাবী এলাকা হিসাবে চিহ্নিত রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র করুণ। রংপুর জেলায় স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ৪ লাখ ৪ হাজার ৪৯৪; স্কুলে যায়না ৪৩ হাজার ৫১ জন। কুড়িগ্রাম জেলায় স্কুলে যাওয়ার উপযোগী ৩ লাখ ৪৮ হাজার। স্কুলে যায়না এক লাখ ১০ হাজার। গাইবান্ধা জেলায় ৩ লাখ ২৭ হাজার ৩২৯টি শিশু স্কুলে যাওয়ার বয়স হলেও তাদের মধ্যে স্কুলে যায়না ১ লাখ ১৫ হাজার। নীলফামারী জেলায় স্কুল উপযোগী শিশুর সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৬৫৭। স্কুলে যায়না ২৯ হাজার ৬৫৭। লালমনিরহাট জেলায় স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার ৪০৭। স্কুলে যায়না ৩১ হাজার ৪১৭ জন। অন্যান্য জেলার চিত্র একই। লক্ষণীয় পত্রিকান্তরের ঐ সাম্প্রতিক খবরেই লালমনিরহাট ও গাইবান্ধার লক্ষাধিক শিশুর স্কুলে না-যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। মাত্র দু' আড়াই মাসের মধ্যে কোন্ যাদুমন্ত্র বলে সে দু'টি জেলা নিরক্ষরতামুক্ত হয়ে গেল, মানুষের মনে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়া স্বাভাবিক।

তাছাড়া, জনকণ্ঠের গত ২১ মার্চের সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দু'বছরে প্রাথমিক স্কুলের প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে গেছে। বেসরকারী (নন-রেজিস্টার্ড) এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ায়-এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঐ প্রতিবেদন থেকে একটি বিষয়ের স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায়না। সরকার যেসব এলাকাকে এক শ' ভাগ সাক্ষর দাবি করছে, সেসব এলাকায় প্রাথমিক স্কুলের ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীদের কি ঐ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? ঝরে-যাওয়া শিক্ষার্থীদের কি সাক্ষর হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে? ঝরে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীর পক্ষে চর্চা ছাড়া অক্ষরজ্ঞান বা স্বল্পশিক্ষা কতদিন পর্যন্ত ধারণ করে রাখা সম্ভব? কোন এলাকাকে নিরক্ষরতামুক্ত বলে ঘোষণা দেয়ার ভিত্তিটা কি? ১৯৯৭ সালের নবেম্বরে বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, যারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে, তাদের দুই-তৃতীয়াংশের চারটি মৌলিক বিষয়ে দক্ষতা নেই। এ বিষয়গুলো হলো– পড়া, লেখা, মৌখিক অঙ্ক ও লিখিত অঙ্ক।

এটা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা যারা শেষ করেছে তাদের অবস্থা। আর, যারা তা শেষ করারও সুযোগ পায়নি, তাদের অবস্থা যে আরও খারাপ হবে, সেটা ব্যাখ্যার দরকার পড়েনা। তাদেরও যদি সাক্ষর হিসাবে ধরে নিয়ে সাক্ষরতার হার এগোচ্ছে বলে দাবি করা হয়, সেটা হবে এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। এর ওপর, আমাদের শিক্ষাখাতে যে-অর্থ বরাদ্দ দেখানো হয়, তা প্রধানত দাতাদের সাহায্যনির্ভর। সেদিক থেকে উন্নয়ন সহযোগীরা যদি সাহায্য ঠিকমতো না দেয়, তবে বরাদ্দ বাড়ানো হলে কিংবা সর্বাধিক করা হলেইবা কি যাবে-আসবে? ঢাকায় প্রকাশিত ইউনিসেফের দ্য স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন '৯৯ শীর্ষক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত বার্ষিক সাত শ' কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রসাধনী এবং ইউরোপে আইসক্রিমের পিছনে যে-বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, এ অর্থ তার চেয়ে কম। ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে, শিক্ষার জন্য দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের অঙ্গীকার তেমন বাড়েনি।

তবে, ঐ রিপোর্টের ভূমিকায় জাতিসংঘ মহাসচিব শিক্ষালাভের অধিকারকে মানবাধিকার হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সবার জন্য শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন লক্ষ্য নেই। তাঁর বক্তব্যটি নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বস্তুত আমাদের দেশে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীসহ আপামর জনসাধারণকেই সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টিকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবেও গ্রহণ করতে হবে। মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কাসহ আমাদের যেসব এশীয় প্রতিবেশী দ্রুত উন্নয়নের-শিখরে আরোহণ করতে চলেছে, শিক্ষাবিস্তার ও সাক্ষরতা-অভিযানকে তারা উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হওয়ার ফলেই তাদের সে-সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমরা যদি শুধু প্রতীকী বা কাগুজে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করি, তাহলে সেটা হবে এক ধরনের অন্ধত্বেরই শামিল। গত বছর আমাদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার' পেয়েছে। সে-পুরস্কারের মর্যাদা যেন আমরা অক্ষুণ্ন রাখতে পারি। উপানুষ্ঠানিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম আরও জোরদার করে তোলা দরকার। সাক্ষরতার হার বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় এবং সাধারণ মানুষের সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমেই কেবল স্থায়ীভাবে বাড়ানো সম্ভব। শুধু সেই লক্ষ্যেই বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।